মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে করণীয়

বিগত এক বছর আগে 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা– চিন্তা ও দুশ্চিন্তা' শিরোনামে একটা গোলটেবিল আলোচনা করেছিলাম। জাতীয় পর্যায়ের অনেক গুণীজন-শিক্ষাবিদ সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ দেশের স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছিল। মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপনায় আমি মাদ্রাসা শিক্ষাসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা এবং কী করণীয় তা অনেকটাই তুলে ধরেছিলাম। অনেক আলোচকদের মধ্যে শুধু দু-জন দেশবরেণ্য আলোচক অন্য আলোচনার সাথে মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সংক্ষিপ্ত কথা বলেছিলেন। একজন বলেছিলেন, 'ব্রিটিশ শাসনের আগেও ভারতবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচলন ছিল। ইংরেজরা সেটা বিচ্যুৎ করেছে। ইংরেজরা কেরানি ও ধর্মযাজক তৈরি করলো। পৃথিবীর প্রতিটা দেশেই ধর্মশিক্ষা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষাকে রি-অর্গানাইজ করা দরকার। মাদ্রাসার বিশাল একটা জনগোষ্ঠীকে অনুৎপাদনশীল রেখে জাতি গঠনে সম্পৃক্ত করতে না পারা উচিৎ নয়।' অন্যজন বলেছিলেন, 'সমাজে দীনি শিক্ষা এবং নন-দীনি শিক্ষা বা বস্তুবাদী জগতের শিক্ষা বলে বিভাজন করে ধর্মটাকে সামগ্রীক শিক্ষা থেকে পৃথক করে ফেলা হয়েছে। এই বিভাজন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে। মাদ্রাসাকে দীনি শিক্ষা বলে অভিহিত করছি। এভাবে মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাদ দিয়ে ফেলেছি। আসলে ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী বিজ্ঞান শিক্ষাকেও দীনি শিক্ষা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আমরা সেটাকে গণ্য করছিনে। আমরা বিজ্ঞান শিক্ষা না থাকার কারণে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেছি।' অন্য আলোচকরা মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে কোনো আলোচনা করলেন না। আমার কপালে চিন্তার ভাজ পড়লো। সন্ধ্যার পর আমার একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকে, যিনি একটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় পদে আসীন, জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই, আপনারা কেউ মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে কোনো কথা বললেন না কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'মাদ্রাসা নিয়ে কথা বললে খুব ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয়।' কথাতে বুঝলাম, 'ইসলামি কোন দল কখন না-জানি কোন কথায় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, তখন মান-সম্মান নিয়ে বিপদে পড়তে হয়, বিরুদ্ধে শ্লোগান হাঁকার ভয় কাজ করে।' আমি তার কথার যৌক্তিকতা আঁচ করতে পারলাম। ভাবলাম, এভাবে ভয় পেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে সবাই এড়িয়ে গেলে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হবে কী করে? দেশের জনগোষ্ঠী জনসম্পদ হবে কী করে? এ দেশে সুশিক্ষিত জ্ঞানী মুসলমান পাবো কোথায়? এই উপমহাদেশ বাদে অন্য কোনো মুসলিম দেশে মাদ্রাসাশিক্ষার এ দৈন্যদশা নেই। এ দেশের মাদ্রাসাশিক্ষা কর্তৃপক্ষ আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত সেই ব্রিটিশ আমল থেকে বলবত রেখেছে। এ দেশের জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশকে অনুৎপাদনশীল কর্মবিমূখ শিক্ষাব্যবস্থায় অঙ্গীভূত করেছে। ইসলামের ইতিহাস ও ধর্মীয় ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, যত নবি-রাসুল-পয়গম্বর এ বিশ্বে এসেছেন সবারই সমসাময়িক সময়ের কোনো না কোনো কর্ম ও পেশা ছিল। তাদের কেউই ধর্মপ্রচার ও ধর্মকে পেশা হিসেবে নেননি। ইসলাম কর্মশিক্ষাকে প্রথম ফরজের পর দ্বিতীয় ফরজ হিসেবে গণ্য করেছে। আমাদের রাসুল (সাঃ) যে যে মাদ্রাসা (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানেও ধর্মের পাশাপাশি কর্ম ও পেশার শিক্ষা ছিল। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যেসব ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে জ্ঞানচর্চা হতো।

গত ৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তরের এক প্রবন্ধে দেখলাম, আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২২ লাখ। কওমি মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। সংখ্যাটা কিন্তু অনেক। শিক্ষার্থীদের সবাই নাবালক অবুঝ শিশু-কিশোর। তাদের মধ্যেও প্রতিভা রয়ে গেছে। এ দেশের এ ফুলকুড়িও পূর্ণ বিকশিত হতে চায়। ভবিষ্যৎ জীবনের ভালো-মন্দ বোঝার বয়স তাদের হয়নি। তাদের মা-বাপ, শিক্ষকমণ্ডলী,

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়ে ভাবতে পারেন। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং এ দেশের দায়িত্ব-সচেতন ব্যক্তিবর্গেরও এ নিয়ে ভাবনা থাকা উচিৎ। বাস্তবে আমরা দেখছি, আলিয়া মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশই বেকার বা ছদ্ম-বেকার। তাদের লেখাপড়ায় অতি নগন্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। টেকনিক্যাল শিক্ষায়ও তাদের অবস্থান নগণ্য। আরবি, ইসলামি শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস নিয়ে তাদের লেখাপড়া বেশি। তারা ধর্ম বেশি বোঝে এটা সত্য, কিন্তু কর্ম বা পেশা অর্থাৎ দেশের পণ্য ও সেবার উৎপাদনে তারা কতটুকু অবদান রাখতে পারছে? জীবনের উৎকর্ষসাধনেই-বা তাদের অবদান কতটুকু? তারা প্রত্যেকে কী একটা মর্যাদাবান পেশা নিয়ে দুনিয়াদারি চালিয়ে যেতে পরতো না? –এটা ভাবার বিষয়। কওমি মাদ্রাসা গ্রামে-গঞ্জে প্রতিটা জনপদে ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। আলিয়া মাদ্রাসার চেয়েও এদের শিক্ষার অবস্থা ভয়াবহ রকমের খারাপ। কুরআন-হাদিস পড়তে জানে। অধিকাংশই কুরআন বোঝে না। বাংলাভাষাটাও ভালোমতো পড়তে ও লিখতে জানে না। অনেকে ভদ্র-দীনদার, নিম্ন-আয়ের পেশাতে অতি কষ্টে জীবন নির্বাহ করে চলেছে। এদের অনেকের সাথেই আমি কথা বলেছি। সৎ হওয়ার কারণে বেশ কিছু বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। ভিত্তিমূল শিক্ষা না থাকাতে কোনো টেকনিক্যাল শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষায় তারা যেতে পারেনি। এদের নিয়ে মোটামুটি একটা গবেষণাও করেছি। জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা না থাকাতে জীবনের ভালো-মন্দ বুঝতে এরা অক্ষম। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা বোঝে, প্রতিটা কাজে ও চিন্তায় ধর্মের প্রায়োগিকতাকে বোঝে না। চিন্তা ও চেতনাকে উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে না। জীবনের উপলব্ধি ও চিন্তাধারার মান অগভীর ও হালকা। জ্ঞান-বিজ্ঞান বোঝে না। শিক্ষা না থাকার কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা নেই। ঘটনা বিশ্লেষণের সক্ষমতা নেই। সমাজবিজ্ঞান-অর্থনীতির জ্ঞান নেই। তাহলে নিজের জীবন গড়বে কীভাবে? প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে ও আদর্শ সমাজ গড়বে কীভাবে? কুরআন নিজেকে 'বিজ্ঞানময় কুরআন' বলে। কুরআন ও হাদিস ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল ও উচ্চ-পেশার মর্যাদা দিয়েছে। অথচ এ দেশের মাদ্রাসাশিক্ষা বিজ্ঞান ও ব্যবসায়শিক্ষাকে দূরে ঠেলে দিয়ে জীবন পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। এটা কীভাবে সম্ভব? ইসলামি অর্থনীতি জীবনব্যবস্থার একটা অন্যতম অবিচ্ছেদ্য দিক। মাদ্রাসাশিক্ষার্থী কদাচিৎ এ বিষয়টা নিয়ে ভাবে।

মূলত কর্ম ও পেশা ধর্ম থেকে আলাদা কিছু না। একটির সাথে অন্যটি প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। ধর্মের জন্যই কর্ম। ধর্মীয় 'জীবনবিধান'ই কর্ম বা কাজ, আবার বিধান মোতাবেক কাজই ইবাদত। কর্ম ধর্মের ফলিত রূপ। কর্মের সমষ্টিই ভিন্ন ভিন্ন পেশা। এগুলো তো ধর্মীয় দর্শনের একটা দিক, যা শিক্ষিত মুসলমানদের শিখতে হবে, জানতে হবে। ধর্মের প্রায়োগিক দিকগুলো একজন মুসলমান নিজে করবে এবং অন্যদের শেখাবে ও বাস্তবে প্রয়োগ করবে। এ দেশের মাদ্রাসাশিক্ষায় আমরা তা উপেক্ষা করছি। আমাদের এ উপমহাদেশের মৌলভি-মাওলানাসহ সাধারণ মুসলমানরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মকে নামাজ-রোজা-হজ ও তসবিহ-তেলাওয়াতের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছে এবং সাধারণ মানুষ ইসলামের উপর লেখা ভালো মানের বইপত্র পড়ে না। শুধু দোয়া-দরুদ শিক্ষা, নামাজ শিক্ষার বই পড়ে। এতে ইসলামের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। আবার আমাদের মৌলভি-মাওলানারা বিচার-বিশ্লেষণ না করে সুর করে ধর্মের উপরিগত ব্যাখ্যা দেন। মুসলমানদের আবেগাপ্লুত করে

তোলেন। 'হক্কুল ইবাদ' নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা নেই বললেই চলে। কর্মের মাধ্যমে ধর্ম পালনের তুলনায় সমাজে ক্রমশই ধর্মীয় লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা বেড়ে চলেছে। এতে আমরা অন্যন্য ধর্মাবলম্বীদের পরিণতির দিকে যাচ্ছি। সাধু না হয়ে সাধু সাজার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছি। ইবাদত বলতে সাধারণ মানুষ সাধারণত নামাজ-রোজা-হজ ও তসবিহ-তেলাওয়াতকে বোঝে। আমরা অনেকেই 'ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান' বলে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলি, বাহবা দিই। বাস্তব কাজে 'পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের' প্রয়োগ কই? অথচ দুনিয়াদারির পুরো বিষয়টাই ধর্মের প্রায়োগিক দিক ও কর্ম বা কাজ। এই কর্ম বা কাজ ছাড়া ধর্ম হয় না। এগুলোও ইবাদত। 'আমলনামা' শব্দের বাংলা অর্থও কাজের বিবরণী। পরকালে আমাদের কাজের হিসাব দিতে হবে। আমরা সবাই আমলনামা ডান হাতে পেতে চাই। কীভাবে আসবে– এ নিয়ে বেখবর। ইসলামে কর্মবিমুখ বৈরাগ্য নেই। বৈধ জীবনযাপন, সংসার জীবন, সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষা এবং দুনিয়াদারির জন্য সকল অনুমোদিত কর্মই ধর্ম, সাথে সৃষ্টিকর্তার প্রতি নিখাদ বিশ্বাস। আমাদের মৌলভি-মাওলানাদের এসব কথা সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশি বেশি প্রচার করতে হবে। আমরা দুনিয়ার কর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মের শুধু পরলৌকিক ব্যাখ্যা দিয়ে চলেছি বলে বাস্তব জীবনে ধর্মকে কাজে লাগাতে পারছিনে। জীবন-জীবীকা ও কাজ এবং সামগ্রীক শিক্ষা (অল ইনক্লুসিভ এজুকেশন) থেকে মুসলমানরা পিছিয়ে গেছে বলে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের এ চরম দুর্গতি চলছে এবং এরা দুর্দশায় পতিত হয়েছে। আমাদের ভূলগুলো খুঁজে বের করার সময় এসেছে। আমাদের দেশের মুসলমানদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন ও দৈন্যতাও তাদের পশ্চাৎপদ চিন্তা ও কর্মের ফসল। মূলত এ দেশের মুসলমানদের দৈন্যদশা ও শিক্ষামানের অবনতির মূলে মুসলমানরা নিজে এবং অনেকটাই মৌলভি-মাওলানাদের অপরিণামদর্শীতা। তাদের মধ্যে শতধাবিভক্তিও আরেকটা কারণ। মুসলমান কোনো পেশা ও পোশাকের নাম নয়। মুসলমান সৃষ্টি ও প্রকৃতির অনুকূলে মানবতাবাদী কতগুলো বৈশিষ্ট্য, কাজ ও চিন্তা-চেতনার নাম। এই কাজ ও চিন্তা-চেতনা যারা ধারন করে তারাই মুসলমান। মৌলভি-মাওলানাদের সংকীর্ণ চিন্তাধারা ও খণ্ডিত শিক্ষার এ সুযোগে ইসলাম বিদ্বেষী মুসলমান নামধারী ছদ্মবেশী একটা অংশ ইসলামি জীবনবিধান ও মুসলমানিত্ব ধ্বংস, মুসলিম সভ্যতা বিনাশ ও সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করার বুদ্ধি আটছে এবং তথাকথিত আধুনিকতার মোড়কে ইহবাদী ও ভোগবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠার জটিল খেলায় রত হয়েছে। এর দায়ভারও মৌলভি-মৌলানারা এড়াতে পারেন না। সমাজবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-বিচ্যুৎ কর্মবিমুখ ও অগভীর জ্ঞানসৃষ্টিকারী খণ্ডিত মাদ্রাসাশিক্ষা ও এর নিম্নগামী মান এজন্য দায়ী। এজন্য আজকের প্রশ্ন একটাই, আমরা কী নিয়ে, কী ভেবে সামনে এগোচ্ছি? আমি মুসলমান। মুসলমানিত্ব আমার অস্তিত্বের সংগে মিশে আছে। যে জাতি তার অতীতকে ভুলে যায়, সে জাতি নিঃস্ব। আমরা সবকিছুর মধ্যে রাজনীতির বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এটা কোনোক্রমেই কাম্য নয়। আমি আমার অস্তিত্বের সাথে কোনোমতেই প্রতারণা করতে পারিনে। এ দেশের মৌলভি-মাওলানা ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের এসব নিয়ে ভেবে দেখার সময় আছে কি না? তারা এ দেশের আত্মবিস্মৃত জটিল-কুটিল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থমুখী রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে পরকালের কল্যাণের আশায় অহিংস মনে ইহকালীন শিক্ষা, কর্ম, সমাজসেবা ও মানবকল্যাণের কাজ করুক– এটা আমার প্রত্যাশা।

যে যত কথাই বলুক না কেন, মাদ্রাসা-শিক্ষার্থীরাও এ দেশের নাগরিক। এ দেশেই তারা আমৃত্যু বসবাস করবে। তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে অবহেলা করে কিংবা পাশ কাটিয়ে আমরা জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত করতে পারবো না। তাদেরকে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা দিয়ে, উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত করে মূল স্রোতধারায় আনতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। মাদ্রাসাশিক্ষায় আপদমস্তক কুসংস্কারাচ্ছন্ন, খণ্ডিত-শিক্ষায় শিক্ষিত, কূপমণ্ডূক মানসিকতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী দেখতে কোনোক্রমেই চাইনে। তাদের মধ্যে সুস্থ ও উন্নত জীবনঘনিষ্ঠ চিন্তাধারার বিকাশ ঘটুক এটা আমরা চাই। আমি মাদ্রাসাশিক্ষাকে সুশিক্ষিত কর্মজীবী যুগোপযোগী মুসলমান তৈরির প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চাই। তাতে এ দেশের মঙ্গল ও জাতীয় উন্নয়ন। এজন্য করণীয় করতে ও বিষয়টা নিয়ে ভাবতে মাদ্রাসা-শিক্ষার সাথে জড়িত মৌলভি-মাওলানা ও মাদ্রাসাশিক্ষা কর্তৃপক্ষই যথোপযুক্ত। তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। দরকার তাদের সদিচ্ছা ও ইচ্ছার বাস্তবায়ন।

এ দেশের মাদ্রাসা-শিক্ষাসহ সর্বাঙ্গীন সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা, মূল্যবোধ ও সমাজসেবা নিয়ে দেশ-সচেতন অনেক শিক্ষাবিদ, দেশপ্রেমী ও সুশিক্ষিত সমাজবিদের অনেক ভাবনার খোরাক রয়ে গেছে। এজন্য এই পত্রিকাকে আমরা একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বেছে নিতে পারি। রাজনীতিকে প্রাধান্য না দিয়ে দেশ ও সমাজ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও সমাজসেবার বিষয়ে বিভিন্ন মতামত আলোচনা করা যেতে পারে। এটাও দেশসেবার একটা নির্বিরোধ পথ হিসেবে দেখা দিতে পারে। দেশপ্রেমী সুশিক্ষিত সমাজ ও পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে বিবেচনায় আনতে পারে।

(১৬ জানুয়ারি ’২৩, দৈনিক যুগান্তর বাতায়ন কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– প্রফেসর, ইউআইইউ; গবেষক ও প্রাবন্ধিক।